কোথায় পাব তারে? অন্য অর্থ, অন্য নীতির সন্ধানে

মৈত্রীশ ঘটক এবং পরীক্ষিৎ ঘোষ

১। মানুষ বড় কাঁদছে

আমাদের তেত্রিশ কোটি দেব-দেবী, প্রায় সমসংখ্যক কল্যাণমূলক সরকারি প্রকল্প তবুও কবির ভাষায় মানুষ বড় কাঁদছে (যদিও আশংকা হয় এই কথা ভেবে আবার সুলভ রুমাল প্রকল্প না শুরু হয়ে যায়)। যেখানে যত সমস্যা পরশুরামের চিকিৎসা বিভ্রাট গল্পের সর্বরোগহর সেই একদলা চ্যবনপ্রাশের মত যেন একটি সরকারি প্রকল্প ঠুকে দিলেই হয় । সংবিধানের দিক থেকেই হোক আর নানা আইন এবং সরকারি প্রকল্পের দিক থেকেই হোক, খাতায় কলমে সত্যি সকল দেশের সেরা আমাদের জন্মভূমি । কিন্তু দারিদ্র্য দূরীকরণ থেকে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-পরিকাঠামো-আইন-কানুন, শুভেচ্ছা আর বাস্তবের মধ্যে ফারাক মাপতে উপমা খুঁজতে গেলে ভূগোল ছেড়ে জ্যোতির্বিদ্যার আশ্রয় নিতে হয়। সরকারি তথ্য পুঞ্জিকার এবং গবেষণা পত্রের ঝকঝকে সাদা পাতায় দারিদ্র্য-অনাহার -অপুষ্টি - অশিক্ষার ক্লান্ত ও কুণ্ঠিত পরিসংখ্যান, পাশাপাশি নানা সরকারি প্রকল্পে খরচের সগর্ব বয়ান । অঙ্ক মেলেনা ।

উন্নয়নের অর্থনীতি বলে একটা আস্ত বিষয় আছে এই সব সমস্যা নিয়ে চর্চা করার জন্যে । কিন্তু নিন্দুকেরা বলেন সে এমন এক বিষয় যার না আছে অর্থ আর না আছে নীতি - অনেক আঁক-টাঁক কষে পণ্ডিতেরা হয়তো বলে বসবেন সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিই দারিদ্র্য দূরীকরণের দীর্ঘমেয়াদী সমাধান এই ধরণের সেরে-গেলে-ভাল-হয়ে-যাবে মার্কা কথা । বামপন্থীরা আমূল সমাজ পরিবর্তনের ডাক দেবেন (অথবা বিশ্বায়ন - বাজার - নয়া-উদারবাদের

ত্র্যহস্পর্শদুষ্ট ঘোর কলিকাল বলে হা-হুতাশ করবেন), মারকাটারি মার্কেটপন্থীরা বলবেন মুক্তবাজারের মহোৎসবেই মানবসমাজের মুক্তি (অথবা সরকার বা রাজনীতি কে নন্দ ঘোষ বলে দুষবেন) । সর্বরোগহর জাদুবটিকায় বিশ্বাসের প্রবণতা সর্বজনীন, সে বাজারই হোক বা বিপ্লব বা সুশীল সমাজ। কিন্তু এর কিছু মারাত্মক পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া আছে ।

প্রথমত, যেকোনো ব্যবস্থারই আমূল পরিবর্তন - সে যে দিকেই হোক না কেন - সোজা ব্যাপার নয় এবং কারোর ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, বিশেষ কিছু ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলাফল । "ম্যাঘ দে, পানি দে" -র মত "বিপ্লব দে" বা "বাজার দে" বললেই সেগুলো আকাশ থেকে এসে পড়বেনা। আর সম্ভবপর হলেও এগুলি দীর্ঘমেয়াদি সমাধান, আর অর্থনীতিবিদ কেইনসের ভাষায় দীর্ঘ মেয়াদে আমরা তো সবাই মৃত । অত সময় কার আছে? একজন মুমূর্ষু রোগী কে এক গ্লাস লেবু-চিনির সরবৎ খাইয়ে দিয়ে "কিছু তো করলাম" ভাবাটা যেমন এক ধরণের আত্মপ্রবঞ্চনা, তেমনই সবই তো "সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ", বা "বিপ্লব হলে সব ঠিক হয়ে যাবে" বলে ওপাশ ফিরে ঘুমতেও যাওয়া যায়না।

দ্বিতীয়ত, সর্বোত্তম সমাধানের আশায় "বেশ ভাল" বা "মোটামুটি"-কে নস্যাৎ করে দেওয়ার অর্থ হল স্থিতাবস্থার সাথে আপস করা । ভাল মামা নাই যদি বা থাকে, নাই মামার থেকে তো কানা মামা ভাল। আড্ডাই হোক বা আলোচনাসভা, বিষয় যাই হোক - ক্ষুদ্রঋণ, পঞ্চায়তি রাজ কি তথ্যের অধিকার - কেউ না কেউ না কেউ বলবেনই, কিন্তু এতে তো আর পরিবেশ দূষণের সমস্যা মিটবেনা, বা জাত-পাত নিয়ে ভেদাভেদ । ডাক্তার ম্যালেরিয়ার ওষুধ দিলে কেউ তো জিজ্ঞেস করেননা যে এটা দিয়ে কি বাতের ব্যাথাও কমবে? অসুখ বুঝে দাওয়াই । অবশ্য এর উল্টো দিকের ভাবনার মধ্যেও সমস্যা আছে । অনেক সময়েই শুনি, চুলোয় যাক বৃহত্তর অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপট নিয়ে তাত্ত্বিক কচকচি । তার চেয়ে অমুক গ্রামে অমুক এনজিও বা তমুক সরকারি সংস্থা বা রাজনৈতিক সংগঠন ভাল কাজ করেছে, এই সব ছোট

প্রাণ, ছোট ব্যথা, ছোট ছোট দুঃখকথা ভাল করে বুঝতে হবে, এই বিন্দুগুলো জোড়া দিয়ে দিয়েই উন্নয়নের বৃহত্তর চালচিত্র ফুটে উঠবে। জঙ্গলের মানচিত্র দেখতে গিয়ে গাছের কথা ভুলে গেলে যেমন গাছের গুঁড়িতে ঠোক্কর লাগার সমূহ সম্ভাবনা, তেমনি গাছের শোভা দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে গিয়ে জঙ্গলের কথা ভুলে গেলে পথ হারাবার বিপদ । এনজিও বা তৃনমূল সংগঠন গুলোর মনোযোগ একটি-দুটি বিষয়ের ওপরেই সচরাচর নিবদ্ধ থাকে (যেমন, ক্ষুদ্রঋণ, বা পরিবেশদূষণ রোধ) । তাঁদের কর্মপন্থা সেই জায়গার জন্যে উপযুক্ত হলেও সর্বত্র খাটবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, অর্থনৈতিক-সামাজিক সমস্যাগুলোর আপেক্ষিক গুরুত্বও স্থান-কাল-পাত্রের ওপর নির্ভর করে । তাই তাঁদের অবদান ও গুরুত্ব মাথায় রেখেও মনে হয় না যে সার্বিক উন্নয়নের জন্যে সরকারি নীতির একটা বৃহত্তর কাঠামোর কোন বিকল্প আছে। [i] সব রোগের জন্য এক দাওয়াই খোঁজা যেমন বিপজ্জনক, কিছু কিছু অসুখে কিছু কিছু ওষুধ মোটামুটি সর্বজনীন ভাবেই কাজ করে, সেখানে সবার জন্যে আলাদা আলাদা ওষুধ আবিষ্কার করতে হবে ভাবাটা চিন্তার বিলাসিতা।

যেখানে বাজারের বিকাশ এবং কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের প্রসার দুইই সীমিত , সেখানে সবসময় অবাধ বাজারের যুক্তি প্রয়োগ করা যায়না যদিও গোঁড়া উদারপন্থীরা তা সব সময় মনে রাখেননা । [ii] উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে ভাল দাম পেলে শহরের মধ্যবিত্ত একজন মানুষ তাঁর বাড়ি বেচে দিতে পারেন, কিন্তু একজন দরিদ্র কৃষকের কাছে চাষের জমি শুধু একটি আয়-উৎপাদনকারী সম্পদই নয়, তা হলো একাধারে বীমাপত্র, অবসর ভাতা, সঞ্চয়ের মাধ্যম, ঋণ নেবার জন্যে বন্ধক, এবং এমন একটি সম্পদ যা মুদ্রাস্ফীতি এবং চুরি-ডাকাতির ঝুঁকি থেকে সুরক্ষিত। তাই তাঁর ক্ষেত্রে এই যুক্তি না খাটার সম্ভাবনাই বেশি ।[iii] আবার, যেখানে সরকারি প্রকল্পের অপচয়-দুর্নীতির-নিষ্ফলতার সাক্ষ্যপ্রমাণ নিয়ে সংশয়ের কোন জায়গা নেই, সেখানে ফুটোপাত্রে জল ঢালার মত সরকারি অনুদান ঢেলে যেতে হবে, কারণ বাজারের সংস্পর্শে সব অশুচি হয়ে যাবে, এও এক ধরণের

মৌলবাদ। শিক্ষা-স্বাস্থ্য যেকোনো ক্ষেত্রেই সরকারের অংশগ্রহণ করা মানেই যে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে সেই পরিষেবার যোগান দেওয়া (যেমন সরকারি স্কুল কি হাসপাতাল), তা তো না। সরকারি অনুদান থাকতে পারে, কিন্তু পরিচালনার দায়িত্ব কোন স্বেচ্ছাসেবী বা বেসরকারি সংস্থাকে দেওয়া যেতে পারে, অথবা শর্তসাপেক্ষ বা নিঃশর্ত অনুদান সরাসরি দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের হাতে দিয়ে দেওয়া যেতে পারে । আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের প্রধান ভূমিকা হতে পারে উপযুক্ত তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা । যেমন, সাম্প্রতিক একটি গবেষণাপত্রে দেখা গেছে স্কুলশিক্ষা সম্পূর্ণ করলে গড় আয় কতটা বাড়ে তা নিয়ে মানুষের ধারণা আর বাস্তবের মধ্যে বিশাল ব্যবধান, আর তাই নিয়ে প্রচার করায় স্কুল শেষ করার সম্ভাবনা উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়তে পারে।[iv] বাজারের শক্তি কে ব্যবহার করেও সাম্যের ও সামাজিক ন্যায়ের উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে, প্রমাণসাপেক্ষ হলেও অন্তত তত্ত্বগতভাবে সেই সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেওয়া যায়না । বাজার মানেই এমন এক ভয়াল নদী নয় যেখানে নামলেই ডুবে যাব এই ভয়ে একই জায়গায় আবদ্ধ থাকতে হবে (যদিও সেই ভয় সব সময় অমূলক নয়) । নৌকো বানিয়ে নদীর স্রোতকে ব্যবহার করে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার কথাও ভাবা যেতে পারে । স্বয়ং কার্ল মার্ক্স উৎপাদন শক্তির বিকাশে এবং প্রতিক্রিয়াশীল সামাজিক কাঠামো ভেঙে চুরে দেবার জন্যে বাজার-ব্যবস্থার প্রগতিশীল ভূমিকার কথা বলেছেন ।

বামপন্থীরা সচরাচর বাজারের গন্ধ আছে এমন কোন কিছুকেই বিশ্বাস করেননা , অথচ সরকারি সংস্থার অপচয়, দুর্নীতি, অপদার্থতা এবং সাধারণ মানুষের প্রতি চরম উদাসীনতা সম্পর্কে তাঁরা অনেক সময়েই নিশ্চুপ থাকেন । আবার উদারপন্থীরা এমনিতে ওঝা ডেকে সব জায়গা থেকে সরকারের ভুত তাড়াতে হবে বলে দাবি করেন, অথচ আবার অর্থনৈতিক সংকটের সময় প্রত্যক্ষ সরকারি অনুদান দিয়ে মুমূর্ষু ব্যাংক ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করার নীতিকে সমর্থন করেন।

বাম-ডান, সরকার-বাজার এই বিতর্কে অনেক সময় আমরা ভুলে যাই যে পথ ও গন্তব্যের মধ্যে কোন সরল জ্যামিতি নেই, উদ্দেশ্য এবং উপচারের মধ্যে কোন ধরাবাঁধা সূত্র নেই । অনেক বিতর্কেই উপচার আর উদ্দেশ্য কে আমরা গুলিয়ে ফেলি, ভজন পূজন সাধন আরাধনা (আরাধ্য আদর্শ যাই হোক না কেন) নিয়ে ব্যস্ত থাকতে গিয়ে জিজ্ঞেস করিনা যে আমাদের মুল উদ্দেশ্য কতদূর সাধিত হল । দেং-শিয়াও পিঙের ভাষায়, ইঁদুর ধরতে পারলেই হোল, কালো কি সাদা বেড়াল তাতে আমার যায় আসেনা । হে পাঠক, ইঁদুরে আপনার রুচি নাও থাকতে পারে, কিন্তু বাম-ডান নিয়ে তুই বেড়াল না মুই বেড়াল বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্তব্যের তাৎপর্য অনস্বীকার্য ।

এখন বাজারের যুক্তি খুব সরল - ফেল কড়ি মাখ তেল । গরিবের হাতে কড়ি নেই, তাই বাজার তার প্রতি উদাসীন। তাই অর্থের ও সম্পদের পুনর্বণ্টনে (যেমন, নানা দারিদ্র্য-দূরীকরণ প্রকল্প, ভূমিসংস্কার) সরকারের ভূমিকা অনস্বীকার্য । আবার আইন-ব্যবস্থা এবং নানা নিয়ন্ত্রক সংস্থার মাধ্যমে আমাদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক আদানপ্রদানে নানা ভাবে মধ্যস্থতা করা এবং বিভিন্ন নিয়মকানুন বলবত করাও সরকারের কাজ । এই ভূমিকা গুলো কার্যত অনেক সময়েই মিলে মিশে যায় কিন্তু আমরা মনে করি এদের আলাদা করেই দেখা উচিৎ । পুনর্বণ্টনের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যে কোন কোন সময় সরাসরি সরকারি হস্তক্ষেপ না করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আপাত-বাজারি কিছু কৌশল ও পদ্ধতি ব্যবহার করলে অধিকতর সাফল্য আসতে পারে । বামপন্থীদের দেখা উচিৎ কোন নীতির ফলে কতটা পুনর্বণ্টন হল, বা কতটা দারিদ্র্য দূর হল, কি পদ্ধতিতে সেটা হল তা নিয়ে মুক্ত মন রাখাই ভাল । খাদ্য-বণ্টন ব্যবস্থার সংস্কারে কুপনের সম্ভাব্য ভূমিকা এবং জমি-অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নিলামের ব্যবহার এই দুটি উদাহরণ ব্যবহার করে এবার এই বিষয়ে আলোচনা করব ।

২। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়

১৯৯১ সালে অর্থনৈতিক উদারিকরণের পর থেকে গড় জাতীয় আয় হু হু করে বেড়েছে বটে, কিন্তু অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্য এখনও আমাদের দেশে প্রবল সমস্যা। ৩ বছরের অনূর্ধ শিশুদের মধ্যে অর্ধেকই অপুষ্টিতে ভোগে, তাদের ওজন বয়সের অনুপাতে যথেষ্ট নয়। প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে এই অনুপাত এক তৃতীয়াংশ। এ ব্যাপারে আমরা হতদরিদ্র আফ্রিকার চাইতেও পিছিয়ে আছি। একদিকে ঝাঁ চকচকে দোকানপাট, বিদেশি গাড়ি ও পণ্যসামগ্রীর ছয়লাপ, ফোর্ব্সের তৈরি করা বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় বহু ভারতীয় নামের ভিড়। অন্যদিকে এক বৃহৎ মূমুর্ষু ও বুভুক্ষু জনতা কোনওক্রমে জীবনধারণ করে চলেছে শহরের বস্তিতে, ফুটপাথে, গ্রামের আটচালা ঘরে। ভারত জ্বলজ্বল করছে না জ্বলছে এই বিতর্কে না ঢুকেও বলা যায় এ অবস্থা সত্যিই বিসদৃশ। এর প্রতিকার কি ?

বামপন্থীরা সরোষে ঘোষণা করে দেবেন বাজার আর বিশ্বায়নের কাছে আত্মসমর্পন করে আমাদের এই হাল হয়েছে, গরিব লোকের শোষনের ফলে আজ একাংশের এই রমরমা। কিন্তু আধা-সমাজতন্ত্রের পথে আমরা যখন ছিলাম, নানা বিধিনিষেধের জালে অর্থনীতিকে জড়িয়ে রেখেছিলাম, দেশে দারিদ্র্যের পরিমান কম বই বেশি ছিল না। অপর দিকে উদারপন্থীরা বলবেন উচ্চতর সমাজের যে শ্রীবৃদ্ধি আজ দেখা যাচ্ছে, তাই প্রমান করে মুক্ত অর্থনীতি অবলম্বন করাই একমাত্র উপায়। ব্যাবসা বাণিজ্যের ওপর বাকি নিয়মকানুনগুলো তুলে দিলেই দরিদ্র সাধারণও উন্নয়নে সামিল হতে পারবেন। এ যেন দুই বিরোধী ধর্মের বাদানুবাদ - এখানে সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের কোনও স্থানই যেন নেই।

অদূর ভবিষ্যতে অপুষ্টি কমাতে গেলে হয় গরিব মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়াতে হবে, অথবা পুষ্টির যোগান সরাসরি তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই। বাজারের মধ্যে আর্থিক সাম্য বা মানবিক পরিণতি ঘটানোর কোনও নিহিত শক্তি নেই, বরং তেলা মাথায় তেল দেওয়াই তার প্রবৃত্তি। সুতরাং অর্থের পুনরবণ্টন ঘটিয়ে

দারিদ্র্য আর অপুষ্টি যদি দূর করতে হয়, তবে সরকারের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গতি নেই। তবে মনে রাখতে হবে যে বাজারি অর্থনীতির কল্যাণে উচ্চশ্রেণীর যে লক্ষ্মীলাভ ঘটেছে, সেখান থেকেই একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাঁদের ওপর কর চাপিয়ে দারিদ্র্য দূরীকরণের বিভিন্ন প্রকল্প চাঙ্গা করে তোলার। বাজারের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল হয়ে বসে থাকলে এই সুযোগের অপচয় করা হবে, আবার সরকারি নিয়ন্ত্রণের জাঁতাকলে বাজারকে পিষে মারলে সুযোগটুকুই জুটত কিনা সন্দেহ আছে।

যাই হোক, অনাহারের সমস্যা সমাধানে সরকারের ভূমিকা কে আইনি রূপ দেবার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার সংসদে জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা বিল পেশ করতে চলেছেন। আইনের খসড়াটি লিখেছেন সনিয়া গান্ধী পরিচালিত জাতীয় উপদেষ্টা পরিষদ, তবে মন্ত্রী মণ্ডল তার কিছু ছোটখাটো অদল বদল করেছেন। প্রস্তাবিত আইনের বেশ কিছু দিক ভাবিয়ে তোলে, সন্দেহ জাগে যে আইন প্রণেতারা অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা না নিয়ে মতাদর্শের ঠুলি এঁটে নিয়মকানুন তৈরি করছেন।

প্রথম সমস্যা হল সুযোগ্য প্রাপকদের কাছে এই পরিষেবা পৌঁছনর ব্যাপারে নতুন কোন ভাবনা চিন্তা নেই। ১৯৯৭ সালের আগে রেশনের শস্তার চাল গম সকলেই কিনতে পারতেন। ৯৭-এর পর থেকে নিয়ম হয় যাঁদের বি পি এল (below poverty line) কার্ড আছে, অর্থাৎ যাঁরা দারিদ্র্য সীমার নিচে আছেন বলে সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছেন, তাঁরাই প্রধানতঃ রেশন ব্যাবস্থার সুযোগ পাবেন। এই উদ্দেশ্য অবশ্যই সাধু, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গরিবদের একটা বড় অংশই সাক্ষ্যপ্রমাণ দাখিল করে বা কর্তা ব্যক্তিদের ঘুষ দিয়ে বি পি এল কার্ড যোগাড় করতে পারেন না, তাই সরকারি সাহায্যের আওতার বাইরে থেকে যান। নতুন আইনে গ্রামাঞ্চলের ৭৫ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলের ৫০ শতাংশ মানুষের শস্তায় চাল গম পাওয়ার কথা, অর্থাৎ সেই গরিবদের খুঁজে খুঁজে বেছে নেওয়ার প্রয়াস জারি রয়েছে। শুধু নিয়ম বানালেই হয় না, সেটা কার্যকর করার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে কি না সেটাও ভেবে দেখা দরকার এবং অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা

নেওয়াটাও জরুরি। আমরা মনে করি এই সব সমস্যা এড়াতে রেশন ব্যাবস্থা কে প্রায়-সর্বজনীন করা উচিৎ, একমাত্র কিছু পরিষ্কার মাপকাঠিতে যাঁরা মধ্য বা উচ্চবিত্ত তাঁদের বাদ দিয়ে (যেমন, তাঁরা আয়-কর দেন কিনা, গাড়ি আছে কিনা)। অন্য সব বিষয়ে একমত না হলেও, এই বিষয়ে জঁ দ্রেজ এবং তাঁর সহযোগী দের সাথে আমাদের কোন মতবিরোধ নেই।

দ্বিতীয় সমস্যা হল, নতুন আইনে রেশন দোকান মারফৎ সরাসরি খাদ্য দ্রব্য মানুষের কাছে পৌঁছনোর সেই পুরনো পন্থা বজায় রাখা হয়েছে। এই প্রকল্পে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়, গুদামে খাদ্যশস্য পচে, সরকারি কর্মচারী এবং ব্যাবসায়ীদের যোগসাজশে শস্তার চাল গম খোলা বাজারে পাচার হয়ে যায় - দুর্নীতি এবং অপচয়ের এ এক অতি-পরিচিত গল্প। ভরত রামস্বামী এবং শিখা ঝা সম্প্রতি হিসেব করে দেখিয়েছেন যে খাদ্যে ভর্তুকি দিতে গিয়ে সরকার যখন ১ টাকা খরচ করেন, তার মধ্যে ৩০ পয়সা খরচ হয় নিছক অপচয়ে, ৪০ পয়সা চলে যায় পাচারকারিদের পকেটে, ২০ পয়সা যায় বড়লোকদের জন্য ভর্তুকিতে, আর মাত্র ১০ পয়সার সুবিধে পান গরিব মানুষ, যাঁদের জন্য এত কান্ড।[v]

এই প্রসঙ্গে খাদ্যশস্য গরিবের কাছে পৌঁছনোর চেষ্টা না করে সরাসরি অর্থ সাহায্য বা কুপন মারফৎ তাঁদের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টার প্রস্তাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় সরকারের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা কৌশিক বসু এবং এই বিষয়ে অন্তত অর্থনীতিবিদদের একটা বড় অংশ একমত। এতে রেশন ব্যাবস্থার অপচয় ও চুরি চামারি অনেকটা বন্ধ হবে। রেশনের দোকানে যোগান না থাকলে, সেই কুপন কাজে লাগিয়ে তাঁরা খোলা বাজার থেকে খাবার দাবার কিনতে পারবেন। এতে তাঁদের সম্ভাব্য বিকল্পগুলো বাড়ছে - যেখানে রেশনের দোকান ভাল কাজ করছে (যেমন তামিলনাড়ু বা ছত্তিসগড়) সেখানে তাঁদের বাজারে যাবার প্রয়োজন হবেনা। কোন জিনিসের নিয়ন্ত্রিত দাম যদি তার খোলা বাজারের দামের থেকে অনেকটা কম হয়, তাহলে বিক্রেতার পক্ষে সেটা বেআইনি ভাবে বেশি দামে বেচে দেবার প্রলোভন খুব বেশি। কিন্তু যেখানে

বিক্রেতা প্রাপককে জিনিস সরবরাহ না করলে কুপন হাতে পাবেননা, এবং তা জমা দিয়ে সরকারের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারবেননা, সেইখানে এই সমস্যা নেই। কুপন নিয়েও কারচুপি হতে পারে, কিন্তু তার সম্ভাবনা কম। যতই হোক, টাকার নোট জাল হতে পারে বলে তো আর আমরা বিনিময় ব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবিনা। এই প্রসঙ্গে একক পরিচিতিপত্র (Unique Identification Card) বা মোবাইল ফোন ব্যবহার করার প্রস্তাবও প্রণিধানযোগ্য। কুপন বেচে দিয়ে কেউ কেউ খাদ্যের বদলে অন্য কিছু কিনতে পারেন, এ কথা ঠিক। কিন্তু এখন যে ব্যবস্থা চালু আছে তার যে অপচয়, তার তুলনায় এই ধরণের সমস্যা কতটা গুরুতর হবে, কোন তথ্যপ্রমাণ ছাড়া তাও পরিষ্কার নয়। কোন বিকল্পই নিখুঁত নয়, প্রশ্ন হল তাদের আপেক্ষিক সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে।

অন্য একটি বিষয়ে আসি। রেশনে চাল আর গমই প্রধানতঃ সরবরাহ করা হয়, কিন্ত এঙ্গাস ডিটন এবং জঁ দ্রেজের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে গরিবরা বড়লোকদের থেকে এ জাতীয় খাদ্যশষ্য বেশি বই কম খান না। তবে তফাৎটা কোথায় ? সম্পন্ন লোকে সুষম আহার করে থাকেন, তাঁদের খাদ্যে প্রোটিন ও ভিটামিনের ঘাটতি নেই। এখানেই গরিবদের সঙ্গে তফাৎ - মাছ, মাংস, দুধ, তরি তরকারি অনেক সময়েই তাঁদের সাধ্যের বাইরে। এ জিনিষের যোগান তো রেশন দোকানে হয় না, খোলা বাজার থেকেই কিনতে হয়। আর বাজারের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যেতে হয় না বলে রেশন দোকান নিজের খেয়াল খুশিতে চলে, সময়ে অসময়ে বন্ধ হয়ে যায়, কখনো লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয়। এ ছাড়াও চিকিৎসার অভাবে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাসের ফলে নিম্নবিত্ত মানুষের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। আরও ভাত খেয়ে এ সমস্যার সুরাহা হবে না, বরং হাতে কিছু টাকা এলে লোকে নিজের প্রয়োজন বুঝে খরচ করতে পারেন।

'গরিবি হঠাও' রাষ্ট্রেরই দায়িত্ব, কিন্তু এ ব্যাপারে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই সরকারকে করতে হবে এমন কোনও কথা নেই। কিন্তু খাদ্যের কুপন বা অর্থ সাহায্যের মধ্যে যেহেতু একটা বাজারি গন্ধ আছে, সরকার-পন্থীদের কাছে

এটা সম্ভাব্য সমাধান হিসেবে অকল্পনীয় । অথচ অন্য সমস্ত ব্যাপারে - সে জনমজুরিই হোক বা কাঁচা বাজার - দরিদ্র মানুষেরা যে বাজারের শক্তির হাত থেকে সুরক্ষিত নন সেটা তাঁরা খেয়াল রাখেননা। একে তাই গোঁড়ামি বললে ভুল বলা হয় না । বামপন্থার মোদ্দা কথা হল ন্যায্য বণ্টন এবং সুযোগের সাম্য । তার জন্যে আয় ও সম্পদের পুনর্বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এখানেই দক্ষিনপন্থীদের সাথে তাঁদের মূল মতভেদ । কিন্তু পুনর্বণ্টনটা কোন পদ্ধতিতে করা হবে, সেটা একটা প্রযুক্তিগত প্রশ্ন, সেখানে খোলা মন রাখাই ভাল । কেউ বলছেনা যে গণবণ্টন ব্যবস্থা পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়া হবে কিন্তু এই ধরণের নতুন কোন প্রস্তাব এলেই গেল গেল রব ওঠে । খাদ্য-বণ্টন ব্যবস্থা শুধু না, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সমস্ত ক্ষেত্রেই সরকারি বন্দোবস্তর পাশাপাশি কুপন বা ভাউচার যা সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করা যাবে, তার মাধ্যমে বিকল্পের সম্ভাবনা বাড়ালে দরিদ্র-শ্রেনীর মানুষের ক্ষমতা বাড়বে বই কমবেনা ।

৩। <u>বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে</u> [vi]

এতক্ষণ আলোচনা করলাম এমন একটা সমস্যা নিয়ে যেখানে বাজারের হাতে ছেড়ে দিলে সামাজিক ন্যায়ের উদ্দেশ্য সাধন হবেনা, তাই সরকারের অংশগ্রহণ প্রয়োজন, কিন্তু সেইখানে সরকারি যোগান-ব্যবস্থার ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে বাজারের সুযোগ নেওয়া যেতে পারে। এবার আসি এমন একটা সমস্যায়, যেখানে বাজার ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকার জন্যে সরকারি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন, কিন্তু সরাসরি বাজারের দাম কে মূল্যায়ণের জন্যে ব্যবহার করার সমস্যা আছে । তাই এই ক্ষেত্রে আইনসভায় সদ্য পেশ হওয়া জমি-অধিগ্রহণ আইন ঔপনিবেশিক আমলের কালা-আইনের থেকে ভাল হলেও এর প্রয়োগে সাম্য এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা এই দুই উদ্দেশ্যের কোনটাই সাধিত হবেনা । প্রস্তাবিত আইনের সীমাবদ্ধতা আলোচনা করে আমরা একটি বিকল্প পদ্ধতির বর্ণনা দেব যার মূলে আছে জমি নিলাম করার প্রস্তাব । এখন নিলাম কথাটির মধ্যেই বেশ একটা হিমশীতল বাজার-বাজার ভাব আছে - “কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে

মনে হয়, জলের মত দামে, ... নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব - অথবা যা নিলেমের নয়, সে সব জিনিস, বহুকে বঞ্চিত করে দুজন কি একজন কিনে নিতে পারে ”। কিন্তু জমি-অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে নিলামের ব্যবহার প্রস্তাবিত নীতির তুলনায় সাম্য ও অর্থনৈতিক দক্ষতা দুই দিক থেকেই শ্রেয় হতে পারে বলে আমরা মনে করি ।

শুধু সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম নয় সারা দেশেই শিল্প বা পরিকাঠামোর জন্য চাষের জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে মুশকিল দেখা দিচ্ছে। চলতি আইন অনুযায়ী সরকার জমি অধিগ্রহণ করলে সে অঞ্চলে জমির যে বাজার দর সম্প্রতি নথিভুক্ত হয়েছে, সেই পরিমান ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নতুন আইন বলছে গ্রামাঞ্চলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বাজার দরের অন্ততঃ চার গুণ, আর শহরাঞ্চলে নিদেন পক্ষে দুই গুণ। এ ছাড়া কিছু বাধ্যতামূলক সুযোগ সুবিধাও রাখা হয়েছে। যেমন পরিবারের কাউকে চাকরি, অথবা ২০ বছর ধরে ২০০০ টাকা মাসিক ভাতা, কিংবা এককালীন ৫ লাখ টাকা। কিন্তু বাজার দরকে কেন ২ বা ৪ দিয়ে গুণ করতে হবে, কেন ৩ বা ৫ দিয়ে নয়, তার কোন ব্যাখ্যা নেই ।

বাজার দরের সমান ক্ষতিপূরণ একেবারেই অযৌক্তিক এবং অন্যায্য। গ্রামাঞ্চলে জমির কেনাবেচা খুবই কম, হিসেব নিকেশ বড় একটা নেই। আসল দামের একটা বড় অংশ গোপন রাখা হয় স্ট্যাম্প ডিউটি এড়াতে। অনেকেই বিপদে পড়ে জলের দরে জমি বেচেন। তবে এসব বাদ দিলেও বাজার দরকে মাপকাঠি করার পেছনে যুক্তির একটা বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। জমির যাঁরা মালিক, তাঁরা যদি বাজার দরকে যথেষ্ট গণ্য করতেন, তা হলে তো জমি বাজারেই বেচে দিতেন সরকারি অধিগ্রহণের জন্য অপেক্ষা না করে। তা যখন করেন নি, তখন ধরতে হবে এঁদের কাছে জমির মূল্য বাজার দরের চেয়ে বেশি, হয়তো বা ঢের বেশি। তা হলে বাজার দরটুকু ধরে দিলে তাঁরা আপত্তি তো করবেনই ।

জমির সব মালিকের কাছে জমির কদর বা মূল্য এক নয়। ছোট চাষি জমি বন্ধক রেখে ধার নিতে পারেন, সম্পন্ন চাষির কাছে ঋণের তেমন প্রয়োজন নেই। যিনি

নিজেই চাষবাষ করেন, তাঁর কাছে জমি মানে বারো মাস কাজের যোগান, আর খাদ্য দুর্মূল্য হলে নিজের ক্ষেতের ফসল খেয়ে জীবনধারণ করার সুযোগ। যিনি অনাবাসী মালিক, হয়তো শহরে থাকেন, তাঁর কাছে এই সুযোগ সুবিধার দাম নেই, খাজনাটুকুই সম্বল। এ সব কারণে মালিকরা কে কত ন্যূনতম দামে জমি ছাড়তে রাজি আছেন, তা নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। আর এই তথ্য একমাত্র তাঁরা নিজেরাই জানেন, কোনও পন্ডিত আঁক কষে তা বের করতে পারবেন না। জমি অধিগ্রহণের নিয়মকানুন এমন ভাবে বানানো উচিৎ যাতে মালিকরা অন্ততঃ তাঁদের নিজস্ব মূল্য বা কদর অনুযায়ী দাম পান। আর অধিগ্রহণের পর চাষের জমি যেটুকু পড়ে রইল, সেটা তাঁদের হাতে যাওয়া উচিৎ যাঁদের কাছে জমির কদর সব চাইতে বেশি।

তবে জমির বাজার যদি ঠিকঠাক কাজ করত, তা হলে কিন্তু বাজার দর অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিলে তেমন সমস্যা হত না। কারণ যাঁদের কাছে জমির প্রয়োজন খুব বেশি, তাঁরা ক্ষতিপূরণের টাকায় কাছেপিঠে অন্য জমি কিনে নিতে পারতেন। দুটি কারণে ব্যাপারটা অত সহজ নয়। প্রথমতঃ, গ্রামাঞ্চলে জমির বাজার খুবই অনুন্নত শহুরে অঞ্চলের মত নয় । গ্রামের ভেতরে কেনা বেচা চললেও বাজার গুলো বিচ্ছিন্ন, ঠিকঠাক সুলুক সন্ধান পাওয়া মুশকিল, ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি পরস্পরের পরিচিত না হন এবং কাছাকাছি না বাস করেন, তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটানোর মত দালাল খুঁজে পাওয়া ভার। দ্বিতীয়তঃ, একটা কারখানা বা টাউনশিপ হলে এলাকায় জমির দর হু হু করে বেড়ে যায়, তাই ক্ষতিপূরণের টাকায় সমপরিমান জমি কেনা দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে।

বাজার দরের থেকে ক্ষতিপূরণ যে বেশি হতে হবে, এ বিষয়ে অতএব কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু কতটা বেশি দিলে চাষিরা খুশি মনে মেনে নেবেন, বিক্ষোভ বন্ধ হবে, সেটা ঠিক করাই শক্ত কাজ। নতুন আইন ঠিক দিকেই এগিয়েছে, তবে আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে। চতুর্গুণ দাম কোনও ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হয়ে দাঁড়াতে পারে, আবার কোনও ক্ষেত্রে হয়তো যথেষ্ট হবে না। যেমন ধরুন উত্তর প্রদেশে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে বানাতে

সরকার যে দামে জমি নিয়েছিলেন, দশ বছরের মধ্যে সেখানে জমির দর অন্ততঃ ৫০ গুণ বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় ৪ গুণ দাম দেওয়া হলেও অসন্তোষ মিটত না ।

একটা বাঁধাধরা ফর্মুলায় না ফেলে নিলামের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণ হলে সব চাইতে ভালো হয় । কারখানা বা পরিকাঠামো বানাতে যে জায়গাটুকু লাগবে, তার সঙ্গে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল জুড়ে সরকার নিলামে খানিক জমি কিনুক । কারখানার এলাকায় যাঁরা নিলামে জমি বেচলেননা, তাঁদের টাকার বদলে পাশাপাশি এলাকায় কেনা জমি হস্তান্তর করা হল ।

উদাহরণ হিসেবে সিঙ্গুরের সমস্যাটাই নেওয়া যাক। ন্যানোর কারখানার জন্য জমির প্রয়োজন ১০০০ একর। তার চারপাশে আরও ১০০০ একর নিয়ে সাকুল্যে ২০০০ একর জমির ওপর নিলাম ডাকা হোক। এই এলাকায় যাঁদের জমি আছে, একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাঁদের নিজস্ব জমির জন্য সরকারের কাছে একটা দাম চেয়ে টেন্ডার জমা দিতে হবে। কত দাম চাইবেন, সেটা সম্পূর্ণ তাঁদের ইচ্ছে। নিলামের নিয়ম হল যে ১০০০ একর জমির ওপর একর পিছু সবচেয়ে কম দাম চাওয়া হয়েছে, সরকার সেই সমস্ত জমি কিনে নেবেন। কি দামে কিনবেন ? প্রথমেই বলে নিই, যে যা দামই হেঁকে থাকুন না কেন, সকলকে একর পিছু একই দাম দেওয়া হবে। যে সমস্ত জমি নিলামে কেনা হল না, তার মধ্যে যে জমিতে সব চাইতে কম দর চাওয়া হয়েছিল, সেটাই সমস্ত জমির দাম হিসেবে ধার্য হবে । এই দামেই বিক্রেতাদের থেকে জমি নেবেন সরকার।

যাঁদের জমি এভাবে নিলামে বিক্রী হল, তাঁদের অভিযোগের কোনওই কারণ নেই, কেন না তাঁরা স্বেচ্ছায় যে দাম চেয়েছিলেন, তার থেকে বেশি বই কম পেলেন না। এই সমস্ত চাষিদের দাবি দাওয়া তো মিটল, কিন্তু সমস্যার এখনও পুরোপুরি সমাধান হয় নি। কারখানার জন্য যে ১০০০ একর চিহ্নিত করা হয়েছে, তার পুরোটাই যে নিলামে উঠে আসবে এমন কোনও কারণ নেই, কারণ নিলাম হচ্ছে আরও বিস্তৃত ২০০০ একর জমির ওপর। ধরা যাক কারখানার চিহ্নিত এলাকার

মধ্যে ৬০০ একর নিলামে বিক্রী হয়েছে, ৪০০ একর এখনও বাকি। এই জমিটুকুর দখল সরকার নেবেন কি করে ? এই জমির মালিকদের জমি ছাড়তে হবে, কিন্তু তাঁরা সমপরিমান জমি পাবেন কারখানার গন্ডির বাইরে। কারখানার চিহ্নিত এলাকার মধ্যে যতটুকু নিলামে কেনা হয় নি, ঠিক সেই পরিমান জমি কেনা হয়েছে বাইরের অংশটাতে, সুতরাং অঙ্কটা মিলতেই হবে।

জমি অধিগ্রহণ আইনের গোড়ার গলদটা ভেবে দেখুন। সরকার মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁদের জমির দখল নিতে পারেন। শুধু তাই নয়, দামটাও নিজের খেয়ালখুশি মত ধার্য করে দেন, জমির মালিকের মতামতের সেখানে কোনওই স্থানই নেই। ক্ষতিপূরণের পরিমানটুকু যদি সরকারি মর্জির বদলে মালিকদের দাবি অনুযায়ী ঠিক হয়, তবে তো জবরদস্তির মাত্রাটা অনেকটাই কমে, অভিযোগের কারণ বিশেষ থাকে না। চাষিদের দুটি অভিযোগ প্রধানত শোনা যায় - ক্ষতিপূরণ যথেষ্ট পাই নি, আর জমি গেলে খাব কি ? যে প্রক্রিয়ার কথা বললাম, সেখানে তাঁরা জমির বদলে জমি পেতে পারেন, আর টাকায় ক্ষতিপূরণ নিলে নিজের দাবির থেকে এক পয়সাও কম পাবেন না।

অবশ্য অধিগ্রহণের খরচ যাতে সাধ্যের বাইরে না চলে যায়, সে জন্য নিলামের আগেই সরকারকে দামের একটা ঊর্ধসীমা বেঁধে দিতে হবে। নিলামের দর সেটা ছাড়িয়ে গেলে অধিগ্রহণ বাতিল করে অন্য কোথাও জমির সন্ধান করা চাই। এ ছাড়াও অন্যান্য সমস্যা আছে, যেমন সব জমি সমান উর্বর নয়, ঘর থেকে জমির দূরত্ব বেড়ে যেতে পারে, জমি হস্তান্তরের একটা ঝকমারি আছে। এ কারণে নিলামের দামটুকু ছাড়াও কৃষকদের একটা এককালীন সাহায্য দেওয়া উচিৎ। ক্ষতিপূরণের সিংহ ভাগটাই নিলাম মারফৎ ঠিক হলে সমস্যা অনেক কমবে ।

৪। <u>শেষ হয়ে হইলনা শেষ</u>

খাদ্য-বণ্টন ও জমি-অধিগ্রহণ এই দুটি বিষয় নিয়ে আমরা যে আলোচনা করলাম তার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন সংযোগ না থাকলেও মূল বক্তব্যে একটা মিল আছে। বাজারি পদ্ধতি আর সরকারি নীতির মধ্যে কোন অবশ্যম্ভাবী বিরোধ নেই। বাজার কে বাজারের মত ছেড়ে দিলে সামাজিক ন্যায়ের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না এটা সত্যি। কিন্তু সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলও যে সামাজিক ন্যায় বা অর্থনৈতিক দক্ষতার দিক থেকে সব সময় যে ভাল হয়না, তার জন্যে প্রাক্তন সমাজতন্ত্রী দেশগুলো অবধি যেতে হবেনা, তার অগণিত উদাহরণ আমাদের চারপাশে। আমাদের প্রস্তাব খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয় - বাজারি কিছু পদ্ধতি ব্যবহার করলে অনেকসময় সরকারি নীতি অধিকতর ফলপ্রসু হতে পারে, আর যদি দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের বিকল্পের সংখ্যা বাড়ে, তাঁদের বাজার এবং সরকার কারুরই দয়া-নির্ভর হতে হয়না।

কিন্তু এ আমাদের বিশ্বাস নয়, প্রস্তাব মাত্র। তথ্যপ্রমাণ যদি একে সমর্থন না করে, নতুন করে ভাবতে হবে। কেইনস কে একবার একজন অভিযোগ করেন, আপনি তো আগে এক কথা বলতেন, এখন অন্য কথা বলছেন। কেইনস উত্তর দেন, তথ্য যদি পাল্টায় তাহলে আমি আমার মতও পালটাই। আপনি কি করেন বলুন তো?[vii] যিনি গোঁড়া বিশ্বাসী এবং মনে করেন সত্যের ওপর তাঁর স্বত্বাধিকার আছে, তাঁর কাছে তথ্যপ্রমাণ অবান্তর। আবার গবেষকেরা অনেক সময়েই তাঁদের গজদন্তমিনারে বসে অভ্যস্ত সাজ-সরঞ্জাম দিয়ে মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্পের মত, যেখানে আলো সেখানে চাবি খুঁজতে ব্যস্ত থাকেন। আশার কথা, সম্প্রতি উন্নয়নের অর্থনীতির জগতে নতুন এক জোয়ার এসেছে যা পরীক্ষা-নীরিক্ষার নতুন কিছু পদ্ধতি এবং চিন্তাভাবনা সম্বল করে দারিদ্র্য-অনাহার-শিক্ষা-স্বাস্থ্য নিয়ে কোন নীতি বা প্রকল্প কাজ করে, কোনটা করেনা এটা নিয়ে নিত্য-নতুন তথ্যপ্রমাণ পেশ করছে। [viii]

উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে যেমন পদ্ধতি নিয়ে ছুঁৎমার্গ পরিত্যজ্য, সেই রকম ফলাফল নিয়েও নিরন্তর তথ্যভিত্তিক মূল্যায়ণ চালিয়ে যেতে হবে । আজ যে পদ্ধতি কাজ করছে কাল তা নাও করতে পারে, বিহারে বা তামিলনাড়ুতে যে নীতি কাজ করছে তা পশ্চিমবঙ্গে নাও করতে পারে । মতাদর্শ আর তত্ত্বের ইমারত প্রয়োজন ঠিকই, কিন্তু তাতে বড় বড় জানলা খোলা রাখতে হবে। শেষ নেই যে, শেষ কথা কে বলবে?

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বর্ধন, টিম বেসলি, ভাস্কর দত্ত, ফাহাদ খলিল, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, দেবরাজ রায়, এবং ই. সোমনাথানের সাথে এই লেখার বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে আমরা উপকৃত হয়েছি । প্রতি পদে মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন মনীষিতা দাশ । দিশা এবং দরিয়া ঘটক নানা ভাবে লেখার কাজে ব্যাঘাত করেছেন । এঁদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ ।

---

[i] এই বিষয়ে প্রণব বর্ধনের লেখা "Our Self-righteous Civil Society", *Economic and Political Weekly of India*, 46(29): 16-18, 2011 উল্লেখযোগ্য ।

[ii] ইচ্ছে করেই দক্ষিণপন্থী শব্দটি ব্যবহার করছিনা, কারণ দক্ষিণপন্থী মতাদর্শের সাথে অনেক সময়েই সাম্প্রদায়িকতা-জাতপাত এই ধরণের নানা রক্ষণশীল ভাবনাচিন্তা জড়িয়ে থাকে যার সাথে উদারবাদের কোন আবশ্যক যোগসূত্র নেই।

[iii] এ নিয়ে এই পত্রিকার গত বছরের পুজোসংখ্যায় প্রথম লেখকের "অর্থনীতির মুদ্রাদোষ" নামক প্রবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

[iv] রবার্ট জেনসেনের "The Perceived Returns to Education and the Demand for Schooling", Quarterly Journal of Economics, May 2010 প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

[v] প্রবন্ধটির নাম "How Can Food Subsidies Work Better? Answers from India and the Philippines" (Working Paper No. 221, Asian Development Bank, September 2010) ।

[vi] এই অংশটি আমাদের যৌথ একটি প্রবন্ধের ওপর ভিত্তি করে লিখিত যা আনন্দবাজার পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর ২২, ২০১১) প্রকাশিত হয় । এই বিষয়ে আমাদের গবেষণাপত্রে আরও বিস্তারিত আলোচনা আছে : "The Land Acquisition Bill: A Critique and a Proposal ", Economic and Political Weekly of India, October 15, 2011.

[vii] উদ্ধৃতিটি হল "When the facts change, I change my mind. What do you do, sir?" (*Lost Prophets: An Insider's History of the Modern Economists* (1994) by Alfred L. Malabre, p. 220)।

[viii] এই বিষয় নিয়ে এই ধারার গবেষণার দুই পথিকৃৎ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্থার দুফ্লোর লেখা সাম্প্রতিক বইয়ে (Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty, Random House, India, 2011) বিস্তারিত আলোচনা আছে ।